ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

১২ এপ্রিল ২০২২

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা দল
রাবেয়া আক্তার কনিকা, রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ
কাওসার আহমেদ, রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ
মো. জুলকারনাইন, *রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন:
অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ*

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে ২০২০ সালে সংক্রমণের শুরু থেকে সরকার করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে বিদেশ থেকে আগতদের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা, নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত ও আইসোলেশন, সংক্রমণ বিস্তার রোধে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ করা, করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান অন্যতম। বাংলাদেশে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরে আসতে মোট চার ধাপে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ (প্রায় ১৩.৮২ কোটি) মানুষকে টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত কৌশল অনুসরণ করে নতুন করে টিকার লক্ষ্যমাত্রা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ (১১.৯২ কোটি) ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে শুরু হওয়া টিকা কার্যক্রম কয়েকটি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপি টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত তিনটি গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান, ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সকল সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও জুন ২০২১ পরবর্তী সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথ/ বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রণোদনা প্রদান, টিকা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা গেছে। উল্লিখিত কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সাধারণ জনগণ বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। এমতাবস্থায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ সুশাসনের বিশেষকরে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার আলোকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য করোনাভাইরাস অতিমারী সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
২. কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও ফলাফল উদঘাটন করা;
৩. কোভিড-১৯ সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা; এবং
৪. গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ, প্রণোদনা প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ ও সাক্ষাৎকার পরিচালনার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে (১) জরিপ, (২) টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ, (৩) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার, এবং (৪) মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

---

* ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় প্রকাশিত গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

১. জরিপ: গবেষণায় সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য দুইটি জরিপ ও কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১: গবেষণা জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

জরিপ	পদ্ধতি	নমুনা
কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ (নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা গ্রহণ)	৪৪টি জেলায় কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন ও দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	১,৮৫০ জন (প্রতি জেলায় ৪০-৪৫ জন)
টিকাগ্রহীতার 'এক্সিট-পোল' জরিপ	৪৩টি জেলার ১০৫টি টিকা কেন্দ্র হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টিকাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ	অস্থায়ী কেন্দ্র হতে ৬২২ জন স্থায়ী কেন্দ্র হতে ৩,৩৯৩ জন
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা জরিপ	উদ্যোক্তার তালিকা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	৪২৫ জন

২. টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ: ৪৩টি জেলায় ১০৫টি টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ যার মধ্যে ৬০টি অস্থায়ী এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্র ছিল।
৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার: ৪৩ জেলার ৪৮টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৭১ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য আগস্ট ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা পরিধি

পূর্বের গবেষণাসমূহের ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. **কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা:** নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, কৌশল, উদ্যোগ, অগ্রগতি, সক্ষমতা।
২. **টিকা ব্যবস্থাপনা:** টিকা পরিকল্পনা ও কৌশল, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, টিকা ক্রয়/ সংগ্রহ, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন, টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন ও টিকা প্রদান।
৩. **কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ**
৪. **করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।**

এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক ছয়টি সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশকগুলো হচ্ছে দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

সারা বিশ্বে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার কর্তৃক টিকা রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে সেরাম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। একক উৎসের ওপর নির্ভতার ফলে ২৬ এপ্রিল ২০২১ থেকে বাংলাদেশে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে চীন থেকে টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ থেকে কস্ট শেয়ারিং বা বিনা মূল্যে টিকা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে জুলাই ২০২১ থেকে গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়। টিকা সংগ্রহে সরকারের তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৯.৬৪ কোটি ডোজ টিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সংগৃহীত টিকা থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১২.৭৭ কোটি মানুষকে প্রথম ডোজ (মোট জনসংখ্যার ৭৪.৯৬ শতাংশ) এবং ১১.২৪ কোটি মানুষকে দ্বিতীয় ডোজ (৬৬.০ শতাংশ) টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করা হয় ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৯৫ লাখ মানুষকে বুস্টার ডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর মানুষকে

টিকার আওতায় নিয়ে আসতে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদি থেকে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থী, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বস্তিবাসী ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় সক্ষমতার ঘাটতি: করোনাভাইরাসের সংক্রমণের দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগার স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে সক্ষমতার অধিক সেবাগ্রহীতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে নমুনা পরীক্ষায় নানাবিধ সমস্যা এখনো বিদ্যমান। সেবাগ্রহীতা জরিপে যারা নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়েছিল তাদের ২৬.১ শতাংশ নমুনা দিতে গিয়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে ৬৮.৬ শতাংশ বলেছেন নমুনা প্রদানের সময় পরীক্ষাগারগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়নি। এছাড়া নমুনা পরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে নমুনা দিতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে আসা (১৭.৩ শতাংশ), পরীক্ষাগারে কর্মীদের দুর্ব্যবহার (১৬.৭ শতাংশ), নিজ বাসা থেকে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা (১০.৩ শতাংশ), নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া (১০.৩ শতাংশ), ভুল প্রতিবেদন দেওয়ার কারণে পুনরায় পরীক্ষা করতে বাধ্য হওয়া (৩.২ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

সকল জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার না থাকার কারণে ঐসব জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে অন্য জেলায় পাঠানো হয় বা মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা পরীক্ষা করে আসে। গবেষণার জরিপে ৪.৮ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা প্রদান করতে হয়েছে। ফলে অন্য জেলা থেকে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পেতে অনেক বিলম্ব হয়। জরিপে দেখা যায় সেবাগ্রহীতাদের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে তাদের গড়ে ২.৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা)।

কিছু ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষায় অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু একটি মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমাদানের সুযোগ রাখার ফলে যাদের এই অ্যাকাউন্ট নেই তারা নমুনা পরীক্ষার ফি জমা দিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভিড় এড়িয়ে দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন পেতে ৯.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে।

অন্য জেলায় গিয়ে এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করতে সেবাগ্রহীতাদের ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি হয়েছে। নমুনা পরীক্ষায় যাতায়াত বাবদ সোবগ্রহীতাদের গড়ে ১৪০ টাকা খরচ করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে)। যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে তাদের যাতায়াত, পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে গড়ে ৩৯৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে তাদের গড়ে ৩ হাজার ৩৮১ টাকা খরচ হয়েছে। পরীক্ষাগারের স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে অতিরিক্ত ভিড়, নমুনা প্রদানে জটিলতা, অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জসমূহ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান, যা কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথাসময়ে যথাযথ জরুরি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা। নিজ জেলায় আইসিইউ সুবিধা না থাকায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত জটিল রোগীদের ভিন্ন জেলা হতে সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, যারা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ১৮.৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অন্য জেলা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সেবা প্রাপ্তির জন্য জেলার ভেতরে বা বাইরে শুধু যাতায়াত বাবদই সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ হাজার ৫৩৫ টাকা খরচ করতে হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন তাদের ৫.৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতা জটিলতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে শয্যা না পাওয়ায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর থেকে শয্যা পেতে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩.৫ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৪.১ শতাংশ অনিয়মিতভাবে চিকিৎসকের সেবা পেয়েছেন। চিকিৎসার সময়ে জরুরি প্রয়োজনে ১৪.৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতার অক্সিজেন পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং ১.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা প্রয়োজন থাকলেও হাসপাতালে চিকিৎসার সময়ে একবারও অক্সিজেন পাননি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৫ শতাংশ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভেন্টিলেশন সুবিধা পাননি, ১৩.৮ শতাংশ প্রয়োজনে যথাসময়ে আইসিইউ সেবা পাননি, এবং ৯ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন সময়ে একবারও আইসিইউ সেবা পাননি। হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সময় ২২.২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা চিকিৎসা সেবা গ্রহণে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যার মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ না পাওয়া (৬৪.৭ শতাংশ), প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা না পাওয়া (৩৩.৩ শতাংশ), ট্রলি, স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ার না পাওয়া (৯.৮ শতাংশ), অ্যাম্বুলেন্স সেবা না পাওয়া (৩.৯ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সেবাগ্রহণকারীদের মতে, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে সেবা না পাওয়ায় হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়া ব্যক্তিদের ৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং ১১.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে সেবার অপ্রতুলতার কারণে ও ভালো সেবা পেতে ২৬.৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের কারণ হিসেবে তারা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালে সেবার মান ভালো (৬০.৯ শতাংশ), বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যায় (৪৪.৯ শতাংশ), ডাক্তার বা পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শে (৪২.০ শতাংশ), আইসিইউ শয্যা পাওয়ার জন্য (২৯.০ শতাংশ), সরকারি হাসপাতালে শয্যা খালি না পাওয়ায় (২৩.২ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণ সেবাগ্রহীতার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা তৈরি করেছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণে শয্যা, ওষুধ, আইসিইউ, অক্সিজেন, ও অন্যান্য খরচসহ সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ যেখানে ৩৫ হাজার ৯৩৮ টাকা, পক্ষান্তরে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৭ টাকা। জরিপে ৩.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবা ও নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণে সাড়া প্রদানে ঘাটতি: করোনাভাইরাস সংক্রমণের দুই বছরে পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা অল্প কিছু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০২১ সালের ৩০ জুন মোট আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ১২৮টি যা ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৮টি। কিন্তু ৩০ জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে মাত্র একটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়। এখনও ৩৪ জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা নেই।

সারণি ২: পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণে অগ্রগতি

পরীক্ষাগারের সংখ্যা			আইসিইউ শয্যা	
৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২		৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
আরটি-পিসিআর-১২৮	আরটি-পিসিআর-১৫৮		আইসিইউ-১,১৬৫	আইসিইউ-১,২৫৯
জিন-এক্সপার্ট-৪৭	জিন-এক্সপার্ট-৫৭		২৯টি জেলায় বিদ্যমান	৩৩টি জেলায় বিদ্যমান
র‍্যাপিড এন্টিজেন-৩৯১	র‍্যাপিড এন্টিজেন-৬৫৯			
২৯টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা	৩০টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা			

অন্যদিকে জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৯৪টি বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৬১ শতাংশ ঢাকা শহরে অবস্থিত এবং মোট আইসিইউ শয্যার ৩৭ শতাংশ বেসরকারি হাসপাতালের। আইসিইউ শয্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা মাত্র চারটি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরীক্ষাগার, আইসিইউ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাজেট ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আইসিইউ না থাকা ৩১টি জেলায় আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণ করা হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগের ঘাটতি: বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলা হাসপাতালে পাঁচটি করে আইসিইউ শয্যা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া ২০২০ সালের জুন মাসে সরকার থেকে সকল জেলা হাসপাতালে ১০টি করে আইসিইউ শয্যা স্থাপনের ঘোষণা করা হয়। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৬ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকার *কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্প* গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ শয্যা, সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম, নমুনা পরীক্ষাগার স্থাপন, টিকা ও বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় করার কথা। কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ৩১টি জেলা হাসপাতালে এখনো আইসিইউ শয্যা স্থাপন করা হয়নি। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের অনুদানের মাত্র ৬.৭ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প বরাদ্দ বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, অবকাঠামোগত জটিলতা ও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা, দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আসার পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে শিথিলতা, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ঠিকাদারদের সক্ষমতার ঘাটতি ও গাফিলতি, তদারকির অভাব, এবং আইসিইউ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের অভাব।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবা ও নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করাতে গিয়ে ১৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। এসকল অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানে সময়ক্ষেপণ, নমুনা পরীক্ষার জন্য সুপারিশ জোগাড় করা, নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১: নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

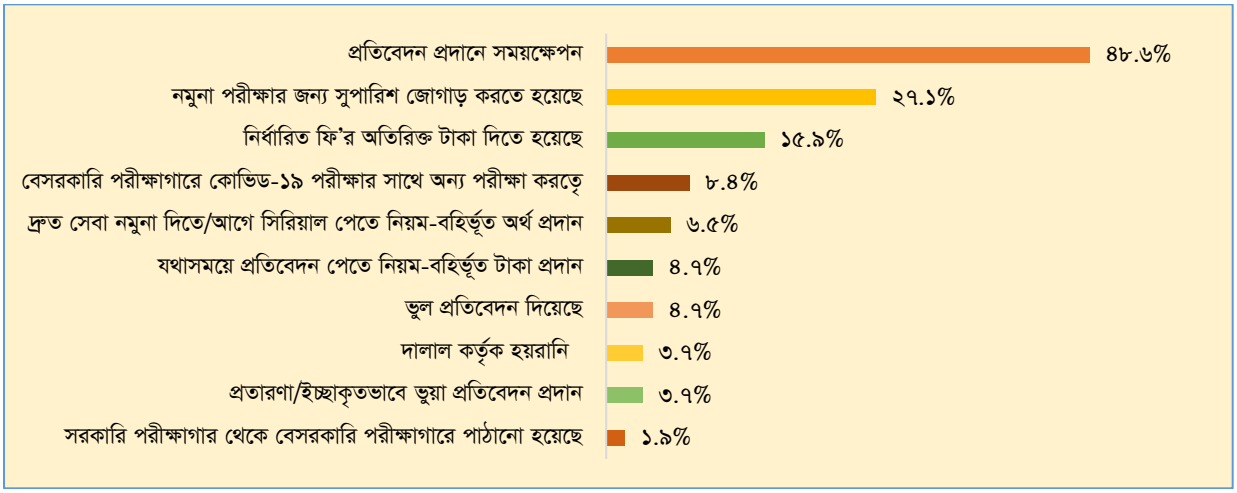

যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গিয়েছে তাদের ১৪.৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে নির্ধারিত ফি অপেক্ষা গড়ে ১১৬ টাকা অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। যারা বাড়ি থেকে নমুনা দিয়েছে তাদের গড়ে ৬৪২ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে, এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে ৪ হাজার ৪২৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার সাথে সাথে অন্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। যথাসময়ে বা দ্রুত প্রতিবেদন পেতে ৪.৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ১৩৩ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে এবং পরীক্ষাগারে ভিড় এড়াতে দ্রুত নমুনা দিতে বা আগে সিরিয়াল পেতে ৬.১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় নেগেটিভ সার্টিফিকেট পেতে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে, এবং বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে প্রত্যাগতদের গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারীদের ২২.২ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ধরনের মধ্যে সেবা দিতে সময়ক্ষেপণ, কোভিড ইউনিটে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপস্থিতি বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা অসহযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের সময়ে সেবাগ্রহীতাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য না দেওয়া, হাসপাতালের কর্মীদের দুর্ব্যবহার, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণে প্ররোচিত করা ইত্যাদি অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে।

চিত্র ২: হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবাগ্রহণে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

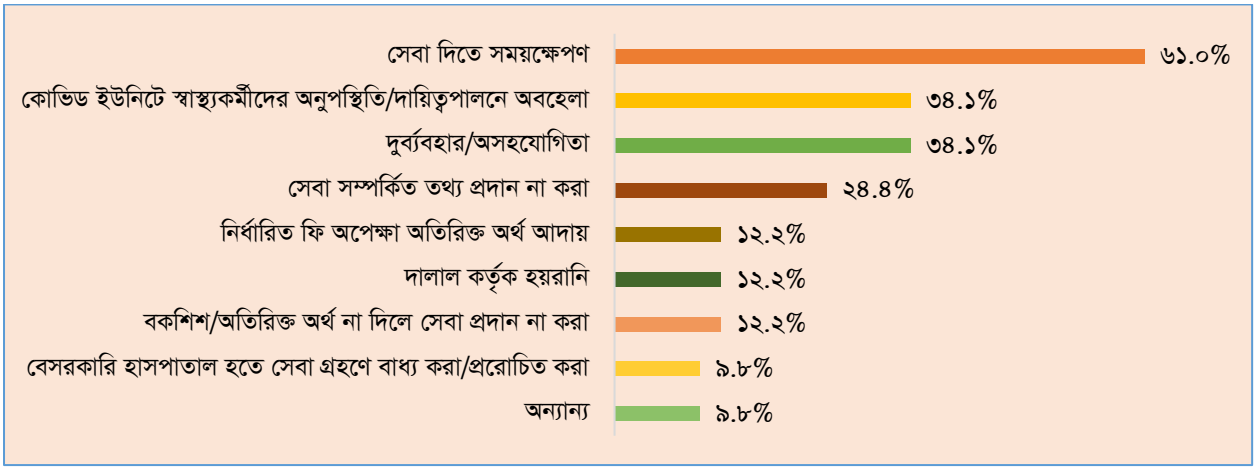

সরকারি হাসপাতাল থেকে কোভিড-১৯ সেবা গ্রহণের সময় ১২.২ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ৪০০ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা ও কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি মানুষের চিকিৎসা খরচের সাথে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে যা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত 'অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২' কৌশলপত্রে করোনাভাইরাস রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে, রোগের সংক্রমণ বিস্তার ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সারা বিশ্বের ৪০ শতাংশ জনসংখ্যাকে এবং জুন ২০২২-এর মধ্যে ৭০ শতাংশ জনসংখ্যাকে পূর্ণ ডোজ টিকার আওতার নিয়ে আসার কথা বলা হয়। এই কৌশলপত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে চারটি মূলনীতি–সমতা, একীভূত টিকা কার্যক্রম, টিকার গুণগত মান এবং সমন্বিত কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে যেখানে আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল জনসংখ্যার সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা, টিকার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা, প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও উদ্বাস্তু মানুষদের টিকার আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি দেশে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। প্রথম ধাপে রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করার জন্য সকল বয়স্ক ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনা, দ্বিতীয় ধাপে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে সকল প্রাপ্তবয়স্কদের, এবং তৃতীয় ধাপে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধ ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে কিশোর-কিশোরীদের টিকার আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সাড়া প্রদানে ঘাটতি: দেশের মানুষকে ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রথম ডোজ টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে থাকলেও পূর্ণ ডোজ টিকা প্রদানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান পঞ্চম। ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে পূর্ণ ডোজ টিকার আনার যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে ৯৮টি দেশ পিছিয়ে ছিল, যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ টিকার আওতায় আসে। প্রথম ডোজ পাওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষায় থাকা জনসংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়নে ঘাটতি: বাংলাদেশে সরকারের জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকার তালিকার ধাপ অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর ৫৬.৬ শতাংশ হচ্ছেন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জনগোষ্ঠীকে প্রথম ধাপে টিকার আওতায় আনার কথা থাকলেও একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ লাখ মানুষ টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছেন (প্রায় ২৯ শতাংশ)। অথচ শেষ ধাপে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের মৃত্যুহার ১ শতাংশের চেয়েও কম। এছাড়া জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় দুর্গম এলাকা, ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ভ্রাম্যমান টিকা দলের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলা হলেও দুই-একটি এলাকা ছাড়া এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

টিকাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি: জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ টিকা নিতে আগ্রহী হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে (৭০.১ শতাংশ)। পক্ষান্তরে স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার হার খুব কম (যথাক্রমে ১৩.২ শতাংশ ও ১৭.৮ শতাংশ)। একটি গবেষণায় দেখা যায় ৪৬ শতাংশ মানুষ টিকা গ্রহণে দ্বিধান্বিত। মানুষের মধ্যে টিকা সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও ভীতি থাকলেও তা দূর করতে প্রচার-উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। অধিকাংশ মানুষ পরিবার-আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টিকার বিষয়ে জেনেছে (৭৪.৯ শতাংশ)। সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত মাইকিং থেকে টিকা বিষয়ে জেনেছে ৩৩.৮ শতাংশ মানুষ এবং টেলিভিশন থেকে জেনেছে ৪৯.৯ শতাংশ মানুষ।

টিকা কার্যক্রমে অসমতা: বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষের টিকা প্রাপ্তি জাতীয় পর্যায়ের অর্জনের চেয়ে নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় আসা মানুষের হার ছিল ৪৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে বেশ কিছু এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন বেদে, হিজড়া, ডোম, হরিজন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে টিকার আওতার বাইরে ছিল ৮০ শতাংশ বা তার বেশি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের মতামতের ভিত্তিতে টিকার আওতায় আসা মানুষের হার দেখানো হয়েছে সারণি ৩-এ।

সারণি ৩: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকা প্রাপ্তির আনুমানিক চিত্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	টিকার বাইরে থাকা জনসংখ্যা	এলাকার সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষিত এলাকা
বেদে	৮০% এর ওপরে	৪টি	৮টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	২টি	

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	টিকার বাইরে থাকা জনসংখ্যা	এলাকার সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষিত এলাকা
হিজড়া	৮০% এর ওপরে	৫টি	১৫টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	৮টি	
হরিজন	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
ডোম	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
বাঁশফোর	৬০% এর ওপরে	১টি	৪টি
	৫০% বা এর নিচে	৩টি	

প্রতিটি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত (ডিসেম্বর ২০২১)

এই ধরনের জনগোষ্ঠীকে কীভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে তা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উদ্যোগে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি জেলার মধ্যে চারটি জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৮টি জেলায় আংশিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, বাকি ১৬টি জেলায় এ বিষয়ক কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এছাড়া টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক মানুষ অসমতার শিকার হয়েছে, যেমন টিকা কেন্দ্রে অন্যের চেয়ে দেরিতে টিকা পাওয়া, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের শিকার ইত্যাদি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি: সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী টিকার আওতায় না আসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষ বলেছে টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকার কারণে টিকা গ্রহণ করেনি। টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকায় অনেকের টিকা বিষয়ে ভীতি রয়েছে ফলে তারা টিকা নিতে আগ্রহী হচ্ছে না। প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ জানিয়েছেন এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা না থাকায় তারা টিকা নিতে পারেননি। কাঠামোগত কারণ হিসেবে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকা, জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা, টিকা কেন্দ্র অনেক দূরে হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া কিছু অতিরিক্ত অর্থ খরচ হওয়ার ভয়েও টিকা নেননি বলে জানান।

টিকা বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি: টিকা কার্ডে টিকাগ্রহীতার অবহিতকরণ সম্মতিপত্রে টিকা সম্পর্কিত তথ্য জানানো, উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামনাসামনি বা অনলাইনে অবগত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। যারা নিবন্ধন করে টিকা নিয়েছে তাদের অধিকাংশরই অনলাইন নিবন্ধন সম্পর্কে ধারণা নেই। ফলে টিকাগ্রহীতাদের বড় একটা অংশ টিকা গ্রহণের পূর্বে টিকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পায়নি। টিকা গ্রহীতাদের ৮০.৯ শতাংশ টিকার উপকাররিতা সম্পর্কে তথ্য পেলেও মাত্র ৪১.৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে, ৪৪.১ শতাংশ কোন টিকা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য পেয়েছে, ৪২.৫ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৮.৬ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে এবং ১৫.৬ শতাংশকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে করণীয় কী সে বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

টিকা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ না করা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলপত্রে আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে দেশের সকল মানুষের সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও খরচের কারণে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষের টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। জরিপে টিকাগ্রহীতাদের বাড়ি থেকে স্থায়ী টিকা কেন্দ্রগুলোর গড় দূরত্ব ৬.৫ কিলোমিটার (সর্বোচ্চ ৫০ কি.মি.) এবং অস্থায়ী বা গণটিকা কেন্দ্রের গড় দূরত্ব ২.২ কি. মি. (সর্বোচ্চ ৩০ কি.মি.)। স্থায়ী কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ টিকাগ্রহীতাদের গড়ে ৭০ টাকা এবং অস্থায়ী বা গণ টিকা কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ গড়ে ৩৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে ৮৬.৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে অন্যের সহায়তা নিয়ে নিবন্ধন করতে হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬.৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতা কীভাবে নিবন্ধন করতে হয় তা জানে না এবং ৬৬.৩ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে টাকার বিনিময়ে দোকান থেকে নিবন্ধন করতে হয়েছে। নিবন্ধন করতে দোকানে যাতায়াত ভাড়া, নিবন্ধন খরচ ও নিবন্ধন কার্ড প্রিন্টসহ নিবন্ধন বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ৫০ টাকা। নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার করণে নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ করতে যাতায়াত বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ১০৬ টাকা যা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের একদিনের আয়ের চেয়ে বেশি।

টিকা কেন্দ্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা না রাখা: টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ৪৫টি টিকা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে টিকা গ্রহণের সময় নারীদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং ৩১টি কেন্দ্র প্রতিবন্ধিবান্ধব ছিল না (কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধিদের জন্য র‍্যাম্প না থাকা, নিচ তলায় টিকা কেন্দ্র না করা, বসার ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি)। প্রবাসীদের টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে 'আমি প্রবাসী' অ্যাপে নিবন্ধন করতে এবং মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারেননি। কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জনশক্তি কর্মসংস্থান অফিস থেকে বিএমইটি নম্বর পেতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য স্বল্প সংখ্যক টিকা কেন্দ্র নির্ধারণ করে দেওয়ায় হয়রানি ও যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়েছে। এছাড়া টিকা গ্রহণের জন্য বিএমইটি নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

টিকা কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা: টিকা গ্রহণের সময় ১৫.৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকা কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৮১.৩ শতাংশ জানিয়েছেন টিকা কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়নি। টিকা গ্রহীতারা টিকা কেন্দ্রে অন্যান্য যে অব্যবস্থাপনার মুখোমুখি হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে টিকা কেন্দ্রে দীর্ঘ সিরিয়াল (৫৮.২ শতাংশ), বসা বা অপেক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা (৪৩.৩ শতাংশ), ভিড় বা সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকা (৩১.৬ শতাংশ), বয়স্ক বা প্রতিবন্ধিবান্ধব সেবার ব্যবস্থা না থাকা (২৯.৯ শতাংশ), টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ কক্ষ না থাকা (২৪.১ শতাংশ), নোংরা পরিবেশ (১৫.১ শতাংশ), টিকা কর্মীদের দক্ষতায় ঘাটতি (১৪,২ শতাংশ), সবগুলো বুথ খোলা না থাকা (১০.৪ শতাংশ) ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি: টিকা কেন্দ্রে টিকা গ্রহণের সময় ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ, টিকা কেন্দ্রে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সুবিধা দেওয়া, দুর্ব্যবহার, এবং কিছু কেন্দ্রে টিকা থাকা সত্ত্বেও টিকা কেন্দ্র থেকে টিকাগ্রহীতাদের ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৩: টিকা কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি (এক্সিট পোল জরিপ)

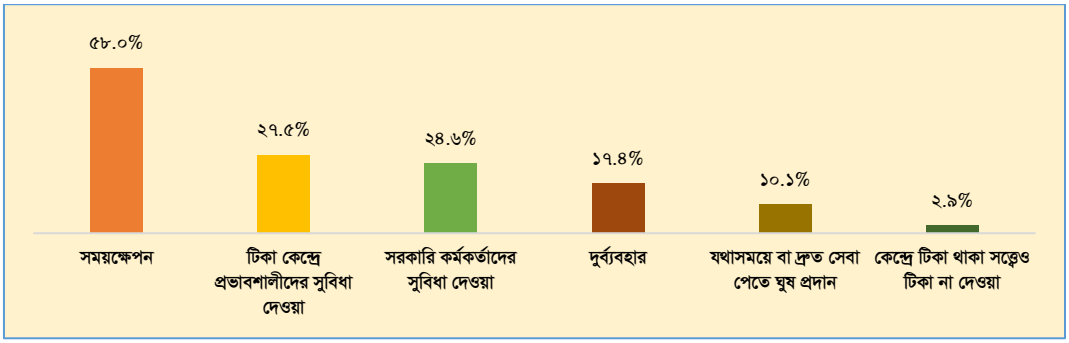

টিকা কেন্দ্রে অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে যথাসময়ে বা দ্রুত টিকা পেতে ১০.১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া প্রবাসীরা টিকার নিবন্ধনের জন্য বিএমইটি নম্বর পেতে ১৫০-২০০ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। দু-একটি কেন্দ্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ১,৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে পছন্দ অনুযায়ী টিকা প্রদান করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে টিকা না নিয়েও টাকার বিনিময়ে প্রবাসীরা টিকা সনদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। টাকার বিনিময়ে টিকা করা একটি গ্রুপ ফেসবুক পেজে প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকার বিনিময়ে টিকা/ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে প্রচার করতে দেখা গেছে।

টিকা কার্যক্রমে জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতি

গবেষণায় পর্যবেক্ষিত ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৫টি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স ছিল না, ৪০টি কেন্দ্রে অভিযোগ কেন্দ্র ছিল না এবং ৩৯টি কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর নম্বর প্রদর্শন করা ছিল না। জরিপে দেখা যায়, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া টিকাগ্রহীতার ১.৫ শতাংশ অভিযোগ করেছে। যারা অভিযোগ করেনি তাদের ৪৪.১ শতাংশ বলেছেন, অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই, ৩০.১ শতাংশ বলেছেন কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ছিল না, ১৪.১ শতাংশ মনে করেন যে অভিযোগ করলে কোনো লাভ হয় না, এবং ১৯.৯ শতাংশ হয়রানি বা ঝামেলার ভয়ে অভিযোগ করেননি।

টিকা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

টিকা ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে গণমাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ে ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্য থেকে জানা যায় ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় ২৯.৬৪ কোটি ডোজ টিকা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সরকারিভাবে ক্রয় করা হয়েছে প্রায় ৯.২ কোটি ডোজ, কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে ৮.৭ কোটি ডোজ টিকা ক্রয় এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও কোভ্যাক্স থেকে অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ১১.৭ কোটি ডোজ টিকা বিনা মূল্যে পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে কোভিশিল্ড প্রতিডোজ ৫ ডলার (৪২৫ টাকা), সিনোফার্ম ১০ ডলার (৮৫০ টাকা) এবং কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং ৫.৫ ডলার (৪৬৭.৫ টাকা) হিসাবে ধরে আনুমানিক টিকার খরচ দাঁড়ায় **১১ হাজার ২৫৪.৪** কোটি টাকা।

সারণি ৪: টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য

টিকার উৎস	টিকার নাম	পরিমাণ (কোটি ডোজ)	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকা)
সরকারিভাবে ক্রয়/ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	কোভিশিল্ড	১.৫	৬৩৭.৫

টিকার উৎস	টিকার নাম	পরিমাণ (কোটি ডোজ)	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকা)
	সিনোফার্ম	৭.৭	৬,৫৪৫
কোভ্যাক্স (কস্ট শেয়ারিং ক্রয়)	সিনোফার্ম সিনোভ্যাক	৮.৭	৪,০৭১.৯
কোভ্যাক্স/ বিভিন্ন দেশের উপহার/ অনুদান		১১.৭	-
মোট		**২৯.৬**	**১১,২৫৪.৪**

টিকা কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয়: জুলাই ২০২১-এ গণমাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে টিকা প্রতি ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখে গণমাধ্যমে টিকা কার্যক্রমে মোট ব্যয় ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সরকারি তথ্যমতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৪.৩৬ কোটি ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের টিকা পরিকল্পনায় টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয় টিকা প্রতি দুই ডলার (১৭০ টাকা) হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া কোভ্যাক্স রেডিনেস অ্যান্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয়ের মডেল করা হয় যেখানে একটি দেশের টিকা কার্যক্রমে বিদ্যমান অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার এবং আউটরিচ কেন্দ্রের অনুপাত বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের পর থেকে মানুষকে টিকা দেওয়া পর্যন্ত সকল ব্যয় হিসাব করে টিকা প্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে ০.৮৪ ডলার (৭১.৪ টাকা) থেকে ০২.৬৪ ডলার (২২৪.৪ টাকা)। সেই হিসাবে টিকা কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৩৯.৬ কোটি টাকা থেকে ৫ হাজার ৪৬৭.৩ কোটি টাকার মধ্যে।

সারণি ৫: টিকা ক্রয় ও প্রাক্কলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়

কস্ট মডেল/পরিকল্পনা	টিকার ডোজ প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
ক. কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপ মডেল	৭১.৪-২২৪.৪*	১,৭৩৯.৬ - ৫,৪৬৭.৩
খ. জাতীয় টিকা পরিকল্পনা	১৭০	৪,১৪২
গ. টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য		**১১,২৫৪.৪**
টিকা ক্রয় ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (ক+গ)		**১২,৯৯৩ - ১৬,৭২১**

উল্লিখিত টিকার প্রক্কিলিত ক্রয়মূল্য ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় দাঁড়ায় **১২ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা থেকে ১৬ হাজার ৭২১** কোটি টাকা যা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবের অর্ধেকেরও কম। শুধু একটি দেশের ক্ষেত্রে টিকার ক্রয়মূল্য প্রকাশ না করার শর্ত থাকলেও অন্যান্য উৎস থেকে কেনা টিকার ব্যয় এবং টিকা কার্যক্রমে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি।

করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাড়া প্রদানে ঘাটতি: সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনা কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলোর অধীনে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ মিলিয়ে মোট ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই প্যাকেজগুলোর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১ লাখ ২১৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, এবং দুই ধাপে ৪ হাজার ২৭৮টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ১ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭৪টি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছে। দুই ধাপ মিলিয়ে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত ঋণ সুবিধা প্যাকেজে ৭৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এর ৫৭.৮ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা প্যাকেজে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ৫২.০ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ: এই খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। করোনাভাইরাসের প্রভাবে ২৫-৩০ শতাংশ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মোট শিল্পখাতের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হলেও এ খাতের জন্য বরাদ্দ প্রণোদনা পর্যাপ্ত নয়। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই খাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পরিমাণ বরাদ্দকৃত অর্থও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছাচ্ছে না। গবেষণায় দেখা যায়, জরিপে অন্তর্ভুক্ত এই খাতের ৩৬.৪ শতাংশ উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন, এবং ১১ শতাংশ এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছেন। যারা ঋণের জন্য আবেদন করেননি, তারা আবেদন না করার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন যে তারা প্রণোদনা ঋণের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানেন না (৪১ শতাংশ) এবং আবেদন প্রক্রিয়া জটিল (২৯.৩ শতাংশ)।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা ঋণ না পাওয়ার কারণ: প্রণোদনা ঋণের জন্য ৩৬.৪ শতাংশ উদ্যোক্তা আবেদন করেছেন এবং ১১ শতাংশ এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছেন। জরিপে ঋণ না পাওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কারও তদবির

বা সুপারিশ না থাকা (২৫.৪ শতাংশ), প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ব্যাংক জামানত না থাকা (২০.৬ শতাংশ), ব্যাংক কর্মকর্তাদের কমিশন না দেওয়ায় অসহযোগিতা (৭.৯ শতাংশ), ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক না হওয়া (৬.৪ শতাংশ) এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ দেওয়া (১.৬ শতাংশ)।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জঃ প্রণোদনা ঋণের আবেদন করতে গিয়ে ৬৭.৫ শতাংশ উদ্যোক্তা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এর মধ্যে সঠিকভাবে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা মূল্যায়ন না করা (২৯.৮ শতাংশ), একই কাজে বারবার ব্যাংকে যেতে হওয়া (২৯.০ শতাংশ), অপ্রয়োজনীয় ও নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত দলিল চাওয়া (২৬.৩ শতাংশ), ঋণের টাকা পেতে বিলম্ব (১৭.৫ শতাংশ), প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা পাওয়া (১৫.৮ শতাংশ), সময়মতো ঋণের টাকা না পাওয়া (১৪.০ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দু-একটি ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের আবেদন করতে গিয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া গ্রাম অঞ্চলে এবং আদিবাসী এলাকাগুলোতে ঋণ প্রদানে বৈষম্যর তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতিঃ প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২৩ শতাংশ উদ্যোক্তা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে অধিকাংশ উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ বা কমিশনের কথা এড়িয়ে গেছেন। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাংকার কর্তৃক ১০ শতাংশ কমিশন দাবির অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রধান অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সময়ক্ষেপণ, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, সুপারিশ জোগাড় করা, হয়রানির শিকার হওয়া ইত্যাদি (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৪: প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

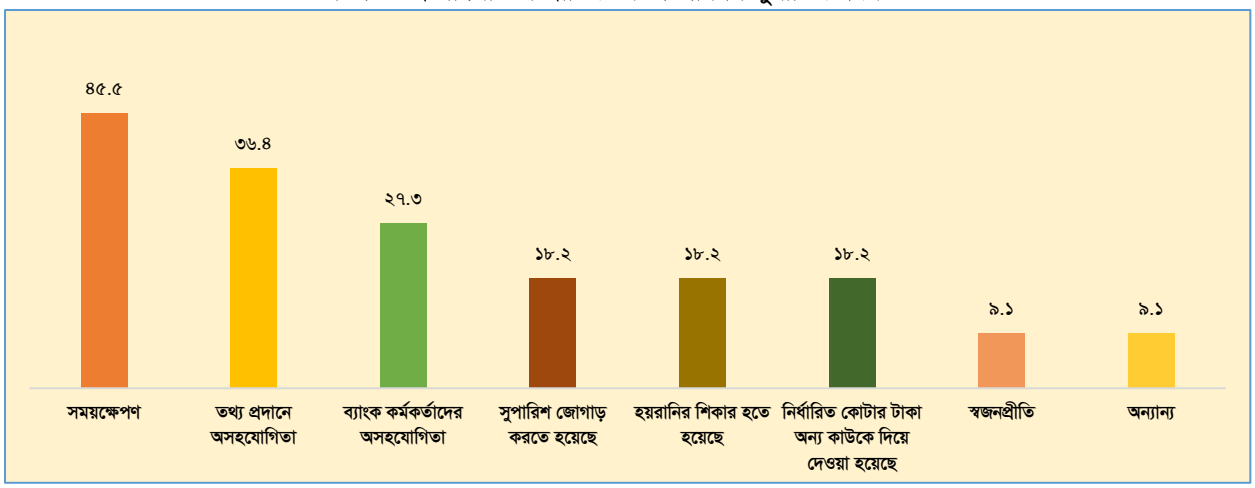

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি, যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্যতা ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজমান। এটি সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে ও অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না যা সুশাসনের সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ।

সুপারিশ

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত

১. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে।

২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে।

কোভিড-১৯ টিকা সম্পর্কিত

৩. বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীদের ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে নিবন্ধন ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রথম ডোজ পাওয়া বিশেষত নিবন্ধন ব্যতীত টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।

প্রণোদনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

৬. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে।

৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কিত

৯. টিকা প্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুদ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১০. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও টিকা সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****